Priyambada – Prabandho – Interview – Likhita Sakshatkar : Bisay Sabarcharit – Nalini Bera

প্রিয়ংবদা -লিখিত সাক্ষাৎকার বিষয় শবরচরিত -নলিনী বেরা

'শবর চরিত' উপন্যাসটি যে অঞ্চলের পটভূমিতে লেখা, সেই একই পটভূমিতে এর আগেও অনেকগুলি লেখা লিখেছেন। আপনার অধিকাংশ গল্পই ওই অঞ্চলের আবহে রচিত। আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্বের লেখাগুলির সঙ্গে 'শবর চরিত' - এর মূলগত তফাৎটা ঠিক কোথায়?

লেখক ঃ সৃষ্টিশীল তথা মৌলিক যে কোনো লেখক বা শিল্পী তাঁর লেখা বা আঁকার মধ্য দিয়ে একটা নিজস্ব ভুবন তৈরি করেন, যে ভুবনের কুশীলবরা, সে মূর্ত বা বিমূর্ত যাই হোক, তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত পরিচিত প্রায় রক্ত - সম্পর্কিত আত্মীয়ের মতোই। তাদের সঙ্গে একমাত্র তিনিই স্বপ্নে জাগরণে, এমনকী ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কথা বলতে পারেন। এভাবেই তৈরি হয়ে যায় দাস্তয়েভস্কির ভুবন, কাফ্কার জগৎ, বা পিকাসোর বিশ্ব। এই স্বীয় রচিত বিশ্বে লেখক বা শিল্পী নিজেকেও প্রক্ষেপ করেন, নিজেকে নিজের অন্তরকে খুঁড়ে খুঁড়ে অন্তর্ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বরূপ দেখান বাইরের পাঠক বা দর্শককে। তাছাড়া, যে ভূখণ্ডে লেখক জন্মেছেন, সে গ্রাম হোক শহর হোক, সেই খণ্ড-ভূখণ্ডের ভূগোল ভূপ্রকৃতি গাছপালা মানুষজনের জীবন চরিত পর্যবেক্ষণের নিত্য নতুন প্রয়াসের মধ্য দিয়ে লেখক প্রত্নতাত্ত্বিকের মতোই আবিষ্কার করে চলেন তাঁর সমগ্র স্বদেশকে, পৌঁছে যান খণ্ড থেকে অখণ্ডে। যেমন তারাশঙ্কর, যেমন বিভূতিভূষণ, যেমন মানিক, যেমন সতীনাথ। কেউ বীরভূম কেউ গোপালনগর কেউ পদ্মা কেউ পূর্ণিয়া থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে। আমি তেমন 'স্টলওয়ার্ড' নই, তবু বলতে দ্বিধা নেই- আমার জন্মভূমি গ্রামকে, গ্রামের ভূগোল ভূপ্রকৃতি গাছপালা ও মানুষজনকে তন্ন তন্ন করে দেখার মধ্যে দিয়েই সমগ্র দেশকে দেখতে চাই। এ-দেখা এখনও আমার ফুরোয়নি, তাই বিভিন্ন লেখায় ফিরে ফিরে আসে একই পটভূমি। তবে এক লেখা আরেক লেখার সঙ্গে মিশে যায় না, নিজগুণে স্বতন্ত্রই থাকে। 'কবি' কখনও 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' হয় না। আমার প্রথম উপন্যাস 'ভাসান' একটি পারিবারিক কাহিনি। মণিময়ের চোখে দিয়ে নিজের পরিবার, বাবা - মা-কাকা-কাকিমা, জেঠিমাদের দেখা। শুধু চোখ দিয়ে দেখা নয়, স্বকণ্ঠে বলা। প্রেক্ষিত সত্তরের নকশাল আন্দোলন, স্থান নয়াগ্রাম-গোপীবল্লভপুর। একরাতের কাহিনি, গ্রামছেড়ে সেইরাতে ভাসানে চলে যাচ্ছে মণিময়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'ইরিনা এবং সুধন্যরা'। সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়কে আধার করে লেখা। শহুরে মেয়ে ইরিনাকে বিয়ে করেছে পান্ডববর্জিত গ্রামেরই ছেলে সুধন্য। এরকম অনেক ইরিনা ও সুধন্যেরই গল্প। শহুরে মেয়ে প্রায় শরৎচন্দ্রের আমলের গ্রামে নিয়ে এসে সুধন্য বেকায়দায় পড়েছে, বহিরঙ্গে এই প্রেক্ষিত থাকলেও, আসল -নকল 'ইল্যুউসান - রিয়েলিটি' আসল মা-নকল মা) গ্রাম - শহর দ্বৈরথ ও তার সমাধান-ই এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু, কোনোমতেই লোকায়তনিক নয়। 'অপৌরুষেয়' একজন না-নারী না-পুরুষ আনন্দীর কাহিনি। আগে 'খালাস' পরে নাম বদলে 'ভাসমান') আরেকটি উপন্যাস, গ্রামকেআধার করেই লেখা। একটি রাতেরই কাহিনি। একরাতে কী ভাবে আলোড়িত হয়েছিল সমগ্র গ্রাম, ঘর ঘর, এমনকী শহর ফেরত মণিময়ের স্বপ্নও - তারই অনুপুঙ্খ বিবরণ, আঞ্চলিক ত নয়ই, সম্পূর্ণ মনোজাগতিক। কে বা কারা হাফ - গৃহস্থ হাফ - সন্ন্যাসী পূর্ণচন্দ্রের যুবতী মেয়েকে গর্ভবতী করে ফেলেছে, তাই নিয়ে বিচার, ঘর - ঘর আলোড়ন ও বিধ্বস্ততা। 'ঈশ্বর কবে আসবে') ঈশ্বর বেহেরা, স্ত্রী নিভাননী ও একটি এঁড়ে বাছুরকে নিয়ে গল্প। ঈশ্বরের পাগল প্রায় ইতিহাসপ্রীতি কীভাবে স্থানিক ইতিহাসকে প্রত্নতাত্ত্বিকের মতো খুঁড়ে খুঁড়ে আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাই নিয়ে 'মিথোলজিক্যাল' কাহিনি। বলাই বাহুল্য, এতকথা সাতকাহণ করে বলতে হচ্ছে। অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে 'শবর চরিত' - এর মূলগত তফাৎটা ঠিক কোথায়, তা বুঝানোর জন্যই। আগেই বলেছি, আমার লেখার কুশীলবরা আমার বাবা - কাকাদের মা, বাবা - কাকা, মা-কাকিরা। আমার পাড়া - প্রতিবেশীরা। আমার রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়রা,সাঁওতাল - ভুঁইয়া - ভূমিজ - লোধা - কাম্হার - কুম্হাররা। 'শবর চরিত' শুধুমাত্র লোধাশবরদের 'চরিত'-ই নয়, সমস্ত অন্ত্যজ 'জঙলী' মানুষদেরই চরিতমালা। তদুপরি জঙ্গলমহাল। সে এক চিত্রবিচিত্রিত বনভূমি, 'শবর চরিত' আখ্যানভাগের একটা বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র এবং আমার আজন্ম পরিচিত। সে জঙ্গল ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে, জঙ্গলের জীব লোধারাও লোপ - 'ইলোপ' হয়ে যাচ্ছে। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা তাদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছেন। নিজেদের কৌম, তার সংস্কৃতিক সভ্যতা, আচার বিচার, সর্বোপরি জঙ্গল ছেড়ে লোধারা আসবে কী আসবে না - ঐ দ্বৈরথ ঐ টানাপোড়েন নিয়েই 'শবর চরিত'। অন্যসব উপন্যাসের থেকে একেবারেই আলাদা।

জন্মসূত্রে আপনি যে আঞ্চলের মানুষ পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক রাজনৈতিক এবং মানবিক মানচিত্রে তার স্বতন্ত্র একটি অবস্থান রয়েছে। সেখানে নানারকম উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষজন বাস করেন। তার মধ্যে শবরদের নিয়ে মহাকাব্যোপম এই উপন্যাসটি লিখলেন। এক্ষেত্রে বিশেষ কোনও প্রবণতা কাজ করছে কি?

লেখক ঃ হ্যাঁ, সুবর্ণরেখার দক্ষিণ তটবর্তী নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানা তথা তৎসন্নিহিত অঞ্চল সমূহ, বিশেষত যে জায়গায় জন্মেছি, তার ভুগোল ভূপ্রকৃতি মানুষজন গাছপালা সব কেমন স্বতন্ত্র, অদ্ভুতুড়ে। মধ্যবর্তিনী বহমান সুবর্ণরেখা তাকে প্রায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। আজ বলে নয় সেই আদিকাল, ইতিহাসের প্রায় সূচনা পর্ব থেকেই। বেশির ভাগ সময়টাই আমরা ছিলাম উৎকলের মধ্যে। এই সেদিনও মাটির দাওয়ায় হেরিকেন জ্বেলে ইংরাজি পড়তে শুনেছি, 'There is a frog, দেয়ার ইজ এ ফ্রগো, সেঠিরে গুটিয়ে ব্যাঙো'। এখনও বারিপদার মুরুডা থেকে প্রকাশদা (আমার জামাইবাবু) এলে বেভুলেবলে ফেলেন, 'নলিনী, ঝাড়া যিব-অ অর্থাৎ 'বড় বাইরে' সাতরে জলের দিকে যাব কী না জানতে চান। বেশিদিন আগের কথা নয়, ইংরেজ আমলে, নয়াগ্রাম - গোপীবল্লভপুরকে উড়িষ্যার সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় কি না, এই মর্মে প্রস্তাব প্রায় পাশ হয়ে যাচ্ছিল, দেশপ্রাণ বীরেন শাসমল সে - প্রস্তাব রুখে দিয়েছিলেন। তা না হলে আজ এই 'ইন্টারভ্যু' বাংলায় না দিয়ে উড়িয়াতেই দিতে হত আমাকে। ঊনিশ শ' ঊনসত্তর - সত্তর সাল, নয়াগ্রাম - গোপীবল্লভপুরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রাম, আমার বাবা - কাকা মা- কাকিমারাও উত্তাল। নিকটবর্তী তপোবন জঙ্গলমহালের 'মধ্যবর্তী এই সেই প্রস্রবণের' মতো সীতানালা খালবেষ্টিত তপোবন আশ্রমও তখন সরগরম। সাধুসেজে নক্শাল নেতারা সেখানে আসছেন যাচ্ছেন। আমাদের মাটির ঘরের ছাদেও আগ্নেয়াস্ত্র জমা হচ্ছে। যেন সামনে 'লড়াই', সেদিনকার নকশাল আর আজকের মাও। জায়গাটা নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক। লড়াইয়ের ভূখণ্ড। শুধু কী আজ? সেই কোন্ প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই। রাঢ়া - সুহ্ম, রাঢ়ীখণ্ড-ঝারিখণ্ড। দিগ্বিজয়ে কে না এসেছেন - রঘু ভীম কর্ণ! ফের বলছি, জায়গাটার ভূগোল-ইতিহাস সবই কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে। অন্তত আমার কাছে। সেখানকার নদনদী পাহাড়-টিলা বন - ডুংরি বট - অশ্বত্থ-ধ-আসন-চল্লা-চুরচু-শাল-পিয়াশাল গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে, হাঁটে। এমনকী, ভুদু-মহুল-কুচলা, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ গাছে যে-সমস্ত ভূত থাকে, সেই সমস্ত ভূতেরাও কতদিন বাঁশের কলম চাঁছতে সাহায্য করেছে। উপদেশ দিয়েছে, এই কর সেই কর, তবেই কলমের ডগাল খুব ছুঁচালো হবে। তারা আমার সঙ্গে 'দাঁড়িয়া' 'বাঘবন্দী' 'হুডুডু' 'কিত্কিত্' 'কাতি' কতরকম খেলা খেলেছে। খেলতে খেলতেহাত - পা কেটে গেলে টিনচার আয়োডিন ডেটল না হোক তাদের ক্ষতস্থানে গাঁদা চাকুন্দার রস তো লাগিয়ে দিয়েছি। প্রচণ্ড খুশি হয়ে তারা আমাকে বরদান করেছে। আর সেই বরে আমি এখনো মাঝে মাঝেই দেখে ফেলি, মানুষগুলো স্থির, স্ট্যাচু। তাদের চারধারের গাছপালা বাড়িঘরদোর, সব কেমন যেন হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে। সেখানে মানুষ শখের ভূত পোষে। আর সে-ভূত বাঁদরের মতো ঘাড়ে মাথায় করে রাস্তাঘাটে ঘুরেও বেড়ায়। পোষাভূত অলক্ষে অন্যের খামার থেকে ধান চুরি করে এনে ভূতের মালিককে বড়লোক বানায়। ধরা পড়লে আবার সভাস্থ পাঁচগ্রামের দশজন বিচারকের সামনে 'গ্রামফান্ডে' জরিমানাও দেয়। এখানে অভাবী কন্যাদায়গ্রস্ত মেয়ের বাপ গলবস্ত্র হয়ে, নদীর দহের দিকে চেয়ে, ঘন্টার পর ঘন্টা ধ্যানস্থ বসে থাকে, দহের ভূত কখন হুস করে নদীজলে ভেসে উঠবে তার মেয়ের বিয়ের যৌতুকের দানসামগ্রী হাতে নিয়ে। এখানকার কামারপাড়ায়, কামারশালে, গভীর রাতে হাতুড়ির ঠুকঠুক আওয়াজকরে জলাশয়ের ভূতের জন্য ঝিঁজরি গড়ে দেয় কামারের কামার রাজাকামার, যে-ঝিঁজরি বা শেকল মানুষের পায়ের আঙুলে শ্যাওলার মতো জড়িয়ে জলাশয়ের ভূত অমোঘ টান দেয়। এখানকারই যুবতী বধূ বড়ুংরির ধারে গভীর রাতে ধনুকের মতো শরীর উল্টো, চার হাত-পায়ে জন্তুর মতো হেঁটে, কপালে জ্বলন্ত প্রদীপ রেখে চরে বেড়ায়। ঘাস নয়, গু খায়। ফাঁকা মাঠে মরা মানুষের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা সেনির বা আঁশ-পাল্নার ভাত-মাংস খিদের জ্বালায় খেয়ে ফেলেছে ছেলে, তার বাপ তাই গালে হাত দিয়ে ভেবে কূল - কিনারা পাচ্ছে না, মানুষের ভাত জ্যান্ত মানুষের পেটে গেলে সে-মানুষ বাঁচে কি বাঁচে না? মেয়েরা হাটে - বাজারে গ্রামে - গঞ্জে/কুরকুট পটমক্ট অর্থাৎ ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ের চাক বিক্রি করে। তেল নুন মাখিয়ে শিলে বেটে, পাতায় মুড়ে, পোস্ত - পোড়ার মতো পুড়িয়ে খায়। খেতেও বেশ, টকটক ঝাল ঝাল। শহর থেকে আসা দিদিমণি নাকে রুমাল চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'এসব পোকামাকড়, পিঁপড়ে - তোমরা খাও?' 'হুঁ খাই, হামরা যে লদ্ধা কঠিন।'

তো, এই লদ্ধা বা লোধা, লোধাশবররা আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। কী শীত কী গ্রীষ্ম কী বর্ষায় আমাদের গ্রামের কুল্হি রাস্তায় এদের হাঁটা - চলার বিরাম নেই। কখনও কাঠভার কাঁধে কখনও ঝুড়িকাঠ মাথায় কখনও দুকাঁধে ছ'টা ছ'টা বারোটা শালবল্লা নিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে হাটে যাচ্ছে, কখনও হাটফেরত পুঁটলি মাথায় কখনও শিকা - বাঁহকের ডগায় কলমিশাকের আঁটি বেঁধে উত্তর থেকে দক্ষিণে নিজেদের গ্রামে ফিরছে। যাওয়ার সময়ও পায়ে - বালিতে মস্মস্, ফেরার সময়ও পায়ে - বালিতে মস্ মস্ আওয়াজ। এটাই যেন তাদের হাঁটা

চলার ছন্দ, 'নেপুর' ঝিন্‌কি'। অধুনা শহরে থাকি, পূজাপার্বণে গ্রামে ফিরি। সেবার কালীপুজো অর্থাৎ আমাদের 'বাঁদনা পরব' -এর আগেই গ্রামে ফিরলাম। একদিন অপরাহ্নে, সন্ধ্যা হব হব সময়ে, রুদ্রজেঠুর সঙ্গে আমাদের মাটির ঘরের দাওয়ায় বসে আছি, সামনে কুল্‌হি রাস্তা। কত লোকই তো যাচ্ছে! সেদিনটা বোধ করি হাটবারও, পরবের আগে শেষ হাট। স্বভাবতই ভিড়। আসন্ন সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে আচমকা মাথায় পুঁটলি জনৈকা মধ্যবয়স্কা মহিলা আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে জোড়হাত করল। তারপর মাথার পুঁটলিটা দাওয়ায় নামিয়ে রেখে গাইতে লাগল, সঙ্গে নাচ)

'প্রেমের আগুন জ্বেলে দিয়ে
পারলে নাই আর নিঝাতে
শ্যাম পারলে নাই আর নিঝাতে
ফুলের মালা হৈল বাসি
পারলে নাই আর পরাতে।'

নাচগান শেষে বকশিস নিয়ে বাড়ি চলে গেল সে। আমি জেঠুকে জিজ্ঞাসা করলাম 'কে বউটি?' জেঠুবলল, ও পিঁদাড়ি হাটে গিয়েছিল, নেশা - ভাঙ করেছে, পরব আসছে তো!'

পিঁদাড়ি? নামটা শোনামাত্রই আমার কত কী মনে পড়ে গেল দিঙ্‌দিঙ্‌ করে! চামটুলোধার বোন পিঁদাড়ি, তার পানপাতার মতো মুখটা ছিল বনআলুর লাবণ্যে ভরা। কেউ কেউ বলত চামটুলোধার নিজের বোন সে নয়, পালিতা। আমাদের দেশে - ঘরে উড়িয়াতে একটা য়াত্রাপালা ছিল, এখনও আছে, 'লোলিতা' বা 'নোলিতা পালা'। সেই পালার সঙ্গে পিঁদাড়ির নিজের জীবনপালা যে কী করে মিশে গিয়েছিল হুবহু! গভীর জঙ্গলে থাকত বসুশবর, ভালো নাম বসুশ্রবা। সঙ্গে থাকত তার যৌবনবতী কন্যা লোলিতা বা নোলিতা। বসুশ্রবার আরাধ্য দেবতা লীলমাধবের বিগ্রহও ছিল সেই জঙ্গলে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন একদিন নীলমাধবের মূর্তি চুরি করতে পাঠালেন বিদ্যা নামের এক ব্রাহ্মণকে। সেই বিদ্যার সঙ্গে জঙ্গলে লোলিতার প্রেম হল। প্রেমে পড়ে নীলমাধবের সুলুক সন্ধান বিদ্যাকে বাতলে দিয়েছিল লোলিতা। আশুতোষের বাবা বিপিন - বুড়োর উঠোনে 'লোলিতা পালা'র আখড়া বসত রোজ। ঢোলকের চাঁচি পড়তআর নিকট প্রতিবেশী আমাদের গ্রামের ঝাড়েশ্বর তার মিলিয়ে বলতে শুরু করত, 'ভিটা উচ্ছান! ভিটা উচ্ছান!' অর্থাৎ যাত্রার নেশায় এবার বিপিনের ভিটোমাটিও উচ্ছন্নে যাবে! সে যাহোক, আমার ছোটকাকা বিজয়চন্দ্র সে-যাত্রায় 'বিদ্যা' সাজত। তার ডায়লগটিআমার এখনও মনে আছে, /দে দে নোলিতা, মোর ছতা - বাড়ি দে, মুল চালি যিমু।* অর্থাৎ দে দে লোলিতা, আমার ছাতা লাঠি দে আমি চলে যাব। আর সেই গানটা

হায় রে দ্বিজ-অ তাঙ্কুর-অ।
নোলিতা নামে কন্যা মোহোরো
সে যে কন্যা মোহোরো

আর আমার বিজয় কাকাও সাজ দিত, মানে তাকে সাজানো হত অবিকল আমাদের গ্রামের হরিমন্দিরের পুরোহিত সেই নারায়ণ দাশ ঠাকুরের মতোই। কাঁচা পাকা চুল, মাথার পিছনে গিঁট দেয়া টিকি। আসলে নারান দাশ ঠাকুর ছিলেন চালচুলোহীন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামের মাতব্বররাই দয়া করে তাঁকে হরিমন্দিরের সেবায়েতের ভার দিয়েছিল। পুজোআচ্চি করতেন, এ-যজমান সে-যজমানের 'সেবা', তার মানে আলুটা মূলোটাতেই তাঁর অন্নসংস্থান হত। 'ভোজনং যত্রতত্র শয়নং হট্টমন্দিরে', শীতগ্রীষ্ম বর্ষা হোক, নারান দাশ ঠাকুর হরিমন্দির চাতালেই মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়তেন। গ্রীষ্মে, দখিনা হাওয়ায় তাঁর খাটানো মশারি নৌকোর পালের মতোই ব্যবহার করত, সে তো আমরা, রাতে, আচমকা ঘুমভাঙা চোখে কতদিন দেখেছি! হরিমন্দিরের চাতালের গা দিয়েই গ্রামের আসা-যাওয়ার কুল্‌হি রাস্তা। লোধারা রাতভিত সেই পায়ে - বালিতে মস্‌ মস্‌ আওয়াজ তুলে যেত আসত, শুধু কি পুরুষ লোধারা, লোধাদের বউড়ীঝিউড়ীরাও। কদিন ধরেই আঁচ করছিল মাতব্বররা, সেদিন হাতে - নাতেই ধরে ফেলল। দখিনা হাওয়ায় নারান দাশ ঠাকুরের খাটানো মশারির পাল যথারীতি উড়ন্ত, কিন্তু কোথায় নৌকা? নৌকো নেই, সে তো ততক্ষণে মাঝুডুব্‌কার জঙ্গলের ভিতরে দোরখুলির লোধাবস্তির চামটুলোধার ঘুপচিতে নোঙর করেছে। পিঁদাড়ির সঙ্গে নারান দাশ ঠাকুরের প্রণয় হয়েছে। ব্রাহ্মণের সঙ্গেলোধানীর প্রেম! আর লোধা মেয়ে - মানুষের সেই নাঙ কিনা আমাদের হরিমন্দিরের পুরোহিত! পুরোহিতের পদ থেকে রাতারাতি বরখাস্ত হয়ে গেলেন নারান দাস। অপমানিত, পতিত নারান দাশ জঙ্গলে লোধাবস্তিতে উঠে গেল। যজমানী ছেড়ে লোধাবৃত্তি ধরলেন। আমরা, গ্রামের লোকেরা খবর পাচ্ছিলাম নারান দাশ বনজঙ্গল ঢুঁড়ে লোধাদের মতোই খামআলু পানআলু চুরচুআলু সংগ্রহ করেন। বামুনদের হাল-লাঙল, কাঠকাটা মানা। তবু তো নারান দাশ কাঠ কেটে কাঠ চেলা করে ঘর - উঠোন রীতিমতো ভতি করে রাখেন। হাটবার হাটবার পিঁদাড়ির মাথায় চাপিয়ে দেন কাঠের বোঝা। হাটে তিনি নিজে যান না। কারণ, পিঁদাড়ির সঙ্গে একত্রে হাটে যেতে নাকি তাঁর লজ্জাই করে। সেই বলে না, /প্রেমেতে মজিলে মন। কিবা হাড়ি কিবা ডোম। আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম, তবু মান - অভিমান হলে 'নোলিতা পালা'র দ্বিজবরের মতো নারান দাশও কি আর পিঁদাড়ির উপর হম্পিতম্বিকরে বলেন না 'দে দে পিঁদাড়ি, মোর ছতা - বাড়ি দে, মু চালি যিমু'?

বছর দুয়েকের ভিতর পিঁদাড়ির এক ছেলে হল, 'গুরভা' না কী যেন নাম, যখন বয়স চার কী পাঁচ নারান দাশ ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন পরলোকে। কোমরে কাপড় পেঁচিয়ে আবার সেই আগের মতোই বনেজঙ্গলে কাঠপাতা সংগ্রহে নেমে পড়ল পিঁদাড়ি। যেখানেই যাক না কেন ছায়ার মতো সঙ্গে থাকে গুরভা। বেঁটেখাটো, একফোঁটা ন্যাঙটাভুটুঙ শুধু যা কোমরের ঘুনসিতে লটকানো তামার একটা কানা পয়সা। আমার মা - কাকিরা বলত, 'নারান দাশ ঠাকুরের মুখটা একেবারে কেটে বসানো'। সেই ছেলেটাই একদিন একটা কীর্তি করল। কুল্‌হিরাস্তায় মায়ের সঙ্গে যেতে যেতে আচমকা হরিমন্দিরে উঠে, হয়তো বা উত্তরাধিকার সূত্রে, ফুলপাতা দিয়ে অং বং মন্ত্র পড়ে পুজো করতে বসে গেল। আর চোখে পড়বি তো পড় মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কেদারের বাপ স্বয়ং শ্রী শ্রী একটা নয় দুটো শ্রী সনাতন বেহেরারই চোখে। কানমলা ও যাচ্ছে গালিগালাজ দিয়ে গুরুভাকে মন্দির চাতাল থেকে জোর করে নামিয়ে দিল সনাতন। লাল চোখ, রাগে গরগর করতে করতে 'ন্যাঙ টাভুটুঙ' গুরভা একদৌড়ে মা পিঁদাড়ির পিছু ধরল, পিঁদাড়ি কোনোকিছু জানতেও পারল না। সেবার বৈশাখ মাসটা যেন ফুরিয়ে গেল বড্ড তাড়াতাড়ি। নগরকীর্তন শেষ। সনাতন বুড়োর ছেলে - বউয়ের ধর্মের গাড়ুতে জল ঢালাও শেষ। ধর্মের গাড়ু হল মাটির ভাঁড়, যার নীচের দিকে ফুটো। তাতে ধান - দুর্বা গোঁজা। হরিবিগ্রহের মাথায় ঝুলানো থাকত গাড়ুটা। সনাতনের ছেলেবউ প্রতিদিন স্নানান্তে সেই গাড়ুতে জল ভরে দেয়, সে - জল হরিবিগ্রহের মাথায় সারাদিন টপ্‌টপ্‌ করে পড়তে থাকে, পড়তে থাকে। এরই নাম বসুধারা বা বসুন্ধরা। তো, বৈশাখ শেষে সেই বসুধারা বা বসুন্ধরা শূন্য, ঠা ঠা। নগর - সংকীর্তনের সময় ছুঁড়ে - দেওয়া কটা শুকনো মালা যা ধর্মের গাড়ুতে তখনও লটকে আছে শুকনো মরা কাঠ হয়ে। গাড়ুর তলায় গোঁজা দূর্বা ঘাসের দুর্দশাও তাই। হাতে নিয়ে মস্‌কে দিলেই গুঁড়ো ঝুরঝুরে। এমন যখন অবস্থা, কোত্থেকেও একফোঁটা জল পাওয়ার উপায় নেই, তখনই কিনা আমাদের গ্রামের লোকেরা এক সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চোখ রগড়ে দেখল, শুধু দেখল বলাটা ঠিক হবে না, বলা যায় আবিষ্কার করল - ধর্মের গাড়ু বেড়ে জল ঝরছে টুপ্‌টুপ্‌! অবাক কান্ড! কেউ তো জল ঢালেনি, তবে জল এল কোত্থেকে? সনাতনের বেটার বউকে, ঝাড়েশ্বর - বায়ার বেটা খুঁ-মদতিকে, চ্যাঙনা - মাঙনারা যারা যারা অষ্টপ্রহর হরিবাসরে বাঘবন্দী, কাতি, কী একম-দুকম খেলা খেলে চলে তাদের প্রত্যেককেই ডেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করা হল - বসুধারার ভিতর জল ঢেলেছে কে? কে? মাতব্বরদের কেউ একজন বলল) আচ্ছা, গাড়ুর ভিতরে পরিষ্কার জলই তো? না অন্যকিছু? একজন, বোধহয়আমাদের গ্রামের মন্মথই, ধর্মের গাড়ু বেয়ে ঝরন্ত জলের ক'ফোটা হাতের চেটোয় ধরে নাকে ছোঁয়াল আর সঙ্গে সঙ্গে উল্লম্ফন দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল, ব্বাসরে! ঝাঁজ কী! কটু গন্ধ কী! পরে শুদ্ধ করে বলল, মূত্র! মোশাই, পরিষ্কার দু'পা - ওয়ালা জন্তুর মূত্র। প্রচণ্ড রাগে হরিমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী শ্রী সনাতন বেরা পূর্ব - পশ্চিম - উত্তর - দক্ষিণ চারধারে দিশা করে ঘুরে ঘুরে অভিশাপ দিল) যে ওই অপকর্মটি করেছে তার যেন তে-রাত্তিরও না পোহায়, ভেদ - বাধ্য হয়ে সে মরে! সেদিনের পরেই ধরা পড়ে গেল পিঁদাড়ি, কেবারে বামালসুদ্ধ, সুবর্ণরেখা নদী থেকে গাড়ু করে জল ভরে এনে 'বসুধারা'য় ঢালছিল সে রাত থাকতে, অন্ধকারে। জল নয়, গাড়ুথেকে মূত্রই ঝরছিল) টুপ টুপ! সনাতন বুড়োর কান ধরে মারার বদলা নিতে গুরুভা-ই 'পিসাব' করেছিল গাড়ুর ভিতর। যেন তে-রাত্রিরও না পোহায়! ধর্মমন্ত বুড়োর সেই অভিশাপে একমাত্র পুত্রের পাছে অকল্যাণ হয়) ঐ ভয়ে পুত্র বৎসলা জননী গাড়ু তে গঙ্গা (এখানে সুবর্ণরেখা)-র জল ঢেলে শুদ্ধ করতে গিয়েছিল চুপি চুপি, গিয়েই হাতে নাতে ধরা পড়েছিল পিঁদাড়ি! গাঁসুদ্ধ লোক বোকা, হতভম্ফহয়ে এই গুহ্য কথাটি সেদিন ধরতে পারেনি বলেই গ্রামের মাথায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁতে ধরা ঘোমটার খুঁটটা, বলতে কী গোটা ঘোমটাটাই খুলে দিয়ে ফিক্‌ করে হেসেছিল পিঁদাড়ি। আজ এতদিন বাদে বাঁদনা পরবে গ্রামে এসে পিঁদাড়িকে দেখে তার সেদিনের সেই হাসিটাই আমার মনে পড়ে গিয়েছিল আগে। পরে, প্রসঙ্গ ক্রমে রুদ্রজেঠু আরো অনেক কথাই বলল লোধাদের সম্পর্কে। বলল ওই তো সেদিন তোর মেজোকাকা কুটুম্বিতা করতে মাঝুডুব্‌কা-সুখজুড়ি - নারদার জঙ্গল পেরিয়ে গিয়েছিল বিশ্বনাথপুর। ফেরার সময় তাকেই ঘিরে ধরল লোধারা, ছিনতাই করবে। গ্যাং - টার মধ্যে চামটুও ছিল। অথচ কদিন আগেই তোর কাকা কব্‌রেজি ঔষুধ দিয়ে চামটুর পেটের ব্যথা সারিয়ে তুলেছিল। বলাই বাহুল্য, আমার মেজোকাকা তল্লাটের নামজাদা কব্‌রেজ। মেজোকাকাকে দেখে সেদিন চামটু অবশ্য লুকিয়ে পড়েছিল ঝোপঝাড়ের আড়ালে, ছিনতাই করা হয়নি। তবে জেঠু আরো বলেছিল যে, আমার জেঠতুতো ভাই ক্ষিতীশের শুধু পরনের

জাঙ্গিয়াটুকু রেখে বাদবাকি সবকিছুই কেড়ে নিয়েছিল লোধারা! আজ পিঁদাড়ির নাচ-গান, তার সেই 'নস্ট্যালজিক' হাসি, লোধাছেলেদের সঙ্গে ওল - ডাঁটার ফুটবল খেলা, মা - কাকিমাদের প্রায় মরসুমের নিত্যদিন লোধাবউড়ি ঝিড়িদের কুড়কুড়িয়া - কাড়হান - পরব কী বালিছাতু 'সাপ্লাই' করা, কেঁদ্ - ভেলা, - ভুড়রু - কুল - বৈঁচি ইত্যাকার নানাবিধ ফ্ 'কুরকুট্পটম' বা পিঁপড়ের ডিম, জাড়া - বরবটি পানআলু - খামআলু -চুরচুআলা বা আউলা - বাঁউলার যোগান দেওয়া) তারা কিনা অবশেষে চোর, ছিনতাইবাজ হয়ে গেল) কিছুতেই বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে পারলাম না। কলকাতায় (তখন বনগাঁয়) ফিরে চোখ বুজলে প্রায়দিনই দেখতে পেতাম) সেই আমি দোরখুলির রুগড়িভরা রাস্তায় সাইকেল চালিয়ে গাছে - পাতায় জাফরি - কাটা জোৎস্না রাতে ফিরছি, ফিরছি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, ফিরছি নারদা - চাঁদাবিলার গ্রাম থেকে। তখন কালো কালো তাঁবুর মতো লোধাদের ঝুপড়িগুলো চোখে পড়ত। কালো কালো মানুষগুলো কালো কালো বিন্দুর মতো যেন ঘুমঘোরে এ - ঝুপড়ি থেকে সে- ঝুপড়িতেযাচ্ছে। ঘোরের ভিতর আমিও লিখে ফেললাম 'শবর পুরাণ'। ছোট বই, ছয় কী সাত ফর্মার। স্থানীয় একটা প্রেস থেকে ছাপা, ছাপাখানার মালিক বললেন, তর্ তর্ করে পড়া যায়। শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ বইটি পড়ে লিখিত ভাবে বললেন, মারকাটারিভাবে এখানেই থেমে থেক না। লিখে যাও। লেখার কথা সিরাজদার বলার আগেই ভেবেছিলাম, করুণা প্রকাশনীর শ্রদ্ধেয় বামাচরণ মুখোপাধ্যায়ের উৎসাহে ও সহযোগিতায় 'শবর চরিত' খণ্ডে খণ্ডে মুদ্রিত হল, এখন তো অখণ্ড।

'শবর চরিত' উপন্যাসে চমৎকার কিছু ডিটেলিং রয়েছে। যে অঞ্চলের পটভূমিতে উপন্যাসটি লেখা তার ভৌগোলিক - প্রাকৃতিক - রাজনৈতিক - সাংস্কৃতিক আবহের অনুপঙ্খ বর্ণনা করেছেন। শবররা তাদের জীবনের প্রতিটিক্ষণ কীভাবে যাপন করেন তারও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। শবরদের সম্পর্কে সকলের সবরকমের কৌতূহল ও জিজ্ঞাসার নিরসন ঘটবে 'শবর চরিত' - এর পাঠক্রিয়ায়।

ওই অঞ্চল এবং মানুষদের ইতিহাস/তথ্য চিত্র রচনার প্রবণতাই কি কাজ করেছে এক্ষেত্রে?

লেখক ঃ সবিনয়ে বলি যে, ইতিহাস বা তথ্যচিত্র তো লিখিনি, লিখেছি 'উপন্যাস'। উপন্যাস রচনার প্রয়োজনে ভূগোল - ইতিহাস - বিজ্ঞান - অর্থনীতি - দর্শন - রাজনীতি ইত্যাদি আসতেই পারে। 'শবর চরিত' -এ যেটুকু দরকার ততটুকুই এনেছি। আর যে 'ডিটেলিং' - এর কথা তুলেছ সে -প্রসঙ্গে একটু বলতে পারি) মাঝুডুব্কা, ঘোড়াটুপুর, তপোবন জঙ্গলমহাল - আমি যেন আমার বাবা - কাকা মা - কাকিদের চিনি, তেমন ভাবেই তিনি। সেই জঙ্গল মহালের অধিবাসী, সাঁওতাল - ভুঁইয়া - ভূমিজ - লোধা বা কাম্হার - কুম্হার - মাহাতো - মাহালী - তাঁতিরা, আমাদেরই স্বগোত্র, স্বজাতি। তাই কখন ফোটে কুড়চি - আঁটারির ফুল, কখন ধরে কেঁদ্ - ভেলা- ভুড়রু - বৈঁচি - কষাফল, কখন মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে - কাড়হান্ - কাড়কুড়িয়া - ছোটবালি - বড়বালি - পরবছাতু - সব, সব আমার মুখস্থ। তাই যখন লোধা- সাঁওতাল বা কাম্হার - কুম্হারা - ভুঁইয়া - ভূমিজদের কচড়া কি মহুল কুড়োনোর কথা লিখি, তখন কলমের ডগায় অনুপঙ্খ উঠে আসে, কোনোকিছু বানাতে হয় না। আমি ধন্য, কৃতজ্ঞ ও গর্বিত আমার সেই জন্মভূমি মা ও মাটির কাছে। প্রেক্ষাপট, প্রেক্ষিত ঐ অঞ্চলকে আধার করলেও 'শবর চরিত' কোনো অর্থেই 'আঞ্চলিক' নয়। 'শবর চরিত' সব অন্ত্যজ জনেরই 'মানব চরিত'।

'শবর চরিত' -এর বর্ণনায় অজস্র ছড়া, প্রবাদ, গান, মিথ, কিংবদন্তী, রূপকথা, পুরাণকথা ইত্যাদির প্রসঙ্গে এসেছে। রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, চতুর্বেদ, পরাশর সংহিতা, বৃহৎ সংহিতা, গর্গ সংহিতা, নিরুক্ত, ব্রাহ্মণ্য, ঐতরেয়, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র) আরও বহু বহু শাস্ত্র পুরাণের প্রসঙ্গ এসেছে। বলাবাহুল্য, এরজন্য আপনাকে রীতিমতো পড়াশোনা করতে হয়েছে। এই পড়াশোনা কি 'শবর চরিত' উপন্যাসটি লেখার জন্যই করেছেন, নাকি ছোটবেলা থেকেই এ ধরনের পড়াশোনায় অভ্যস্ত? বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে আপনি তো অর্থনীতির ছাত্র। তা সত্ত্বেও এ-ব্যাপারে এতটা উৎসাহ সচরাচর দেখা যায় না।

লেখক ঃ একটা কথা গোড়াতেই কবুল করে নিই যে, যে-অঞ্চলে জন্মোছি সে - অঞ্চলটা 'পূরাভমির' অন্তর্গত। 'পূরাভূমি' সেই ভূমি, যে-ভূমি সৃষ্টি কালে হিমালয়েরও সৃষ্টি হয়নি। হিমালয় তখনও টেথিস সাগরে ডুবেছিল। তার আগেই তৈরি হয়ে গেছে ছোটনাগপুরের মালভূমি। উত্তর কোয়েল, দক্ষিণ কোয়েল, অজয়, দামোদর, সুবর্ণরেখা। এসব নাম তো আর সেখালে ছিল না, তাছাড়া ভূকম্পনের ফলে বারবার মাটি চাপা পড়ে নদীখাত উল্টেগেছে, মাটি চাপা পড়েছে; আবার উঠেছে। এখানকার মূল আদিবাসী, সাঁওতাল - বিরহ্ড় - লোধা - ভূমিজরাও কম প্রাচীন নয়। আমাদের গ্রামের অনতিদূরেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথিত 'তপোবন' বা বাল্মীকি মুনির আশ্রম আছে, যেখানে লব-কুশ জন্মেছেন। সীতানালা খাল আছে, যে - খালের উৎসমূলে পোয়াতি সীতা হলুদ মেখে স্নান করেছেন, সে - জল এখনও হলুদ। শাল দাঁতন দিয়ে দাঁত মেজেছেন, দাঁত মেজে দাঁতনটা চিরে দু'ভাগ করে তাই দিয়ে জিভ ছুলেছেন। সেই চেরা দাঁতন থেকে দু-দুটো মহীরুহ শালগাছ জন্মেছে, সে শালগাছ এখনও আছে। আছে তাড়কারাক্ষসীর হাড়, আছে হনুমান চৌকি। আছে প্রায় পাঁচ-ছশ বছরের প্রাচীন রামেশ্বর নাথ জীউর মন্দির, উৎকলীয় ধাঁচে তৈরি। আছে জাহাজ কানার জঙ্গল, যে - জঙ্গলের গাছপালা এ দেশীয় শাল-পিয়াশাল-ধ - আসন - করম - কইম নয়, সম্পূর্ণ আলাদা জাতের। নাকি সমুদ্র তখন অনেক কাছে ছিল, সুবর্ণরেখায় জোয়ার আসত, তার মোহনায় 'প্পিলি' নামের এক বন্দর ছিল। নাকি 'ওক্কলবা' (উৎকল' থেকে একটি বিদেশি জাহাজ 'আদজেত্তা' (তাম্রলিপ্ত) বন্দরে মশলা ও আরো নানাধরনের তৈজস নিয়ে আসছিল। আসতে গিয়ে সুবর্ণরেখা নদীতে ঘুর্ণিঝড়ে ডুবে যায়। সেই ডুবোজাহাজের উপর বছরের পর বছর বালিপোতা মাটিপোত হয়ে চর জেগে ওঠে 'জাহাজকানার'। তাতে সেই বিদেশি বীজ থেকে নানাজাতের গাছ জন্মায়। সেই গাছ এখনও আছে। নাকি সেই লুপ্ত জাহাজের ঝল্সে ওঠা কানা এখনও সুনসান দুপুরে খর রৌদ্রে কী ফিন্ফোটা জ্যোৎস্নায় দেখা যায়।) এসব 'মিথ্' 'কিংবদন্তী' আমার আজন্ম শোনা, সেই কোন্ ছোটবেলা থেকেই। তার উপর ছিল আমাদের বাবা - কাকাদের মা - কিংবদন্তীর্ উপর কিংবদন্তী। বলাই বাহুল্য তার বলা 'কাহিনী' ওই অঞ্চলটাকে 'কুহকে' কুয়াশায় ঢেকে রাখত। তাই জ্ঞান হওয়া অবধি আমি মেলাতে চেষ্টা করতাম) 'এখন' আর 'তখন'। কী ছিল এই অঞ্চল আদিতে, আমাদের চৌদ্দ পুরুষ, তাদের চৌদ্দ পুরুষরাই বা কেমন ছিল? উল্লেখ আছে কী 'রামায়ণ' 'মহাভারত' - এ? পান্ডবরা অজ্ঞতবাসে এসেছিল কী এখানে? কিংবা 'বিষ্ণুপুরাণ' -এ নদীর জন্মকথার মধ্যে সুবর্ণরেখার উল্লেখ আছে কি? মূলত উৎস সন্ধানেই (Roots) আমার যাত্রা পথ চলাচলি। আমার লেখা 'অপৌরুষেয়' ঈশ্বর কবে আসবে' 'শবর চরিত', প্রায় প্রতিটি উপন্যাসই আমার জন্মভূমি স্থান - কালকে জড়িয়ে প্রত্নপ্রাচুর্যে উঠে আসে। স্ফভাবতই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছি, এখন ও করি, ভবিষ্যতেও করব। তাবলে শুধু কী পুরাণশাস্ত্রাদি? পড়তে হয় ভূগোল, ইতিহাস, দর্শন। পড়ি বোর্হেস, কার্পেন্তিয়র, ফুয়েন্তেস, গার্সিয়া মার্কেজ, কাম্যু, কাফ্কা, উমবার্তো উকো, মারিও ভার্গোস লোসা, সারামাগো ক্যালভিনো, ওরহান পামুক, কোহেল হো, কোয়েৎজি হাতের কাছে যখন যা পাই। হ্যাঁ, বিদ্যায়তনিক ক্ষেত্রে আমি অর্থনীতির ছাত্র ঠিকই। তবে হায়ার সেকেন্ডারিতে আমি ছিলাম বিজ্ঞানের ছাত্র। পাশ করার পর ভর্তি হয়েছিলাম 'বাংলা অনার্স'-এ, মেদিনীপুর কলেজে। তখন মনমোহন দত্ত বাংলার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট। ছ'মাস বাদেই বাংলা ছেড়ে চলে এলাম ফিজি' -এ। শ্রদ্ধেয় বাংলার স্যার একদিন ডেকে ধমক দিয়ে বলেছিলেন, /তোমার ভব্যতার অভাব হয়েছে।* তারপর ছ'মাস ফিজি' পড়ে এক বছর বাদে আবার 'অর্থনীতি', ঝাড়গ্রাম রাজকলেজে। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের কথাটা এখনও ভাবি, আমার ভব্যতার অভাব বোধ করি এখনও ঘটেই চলেছে, ঘটেই চলেছে।

সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এখন একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, ফোক্আর্ট (Folk Art), ফোক আঙ্গিক এমনকী বিষয়ের ক্ষেত্রেও ফোক - এর দিকে ঝোঁক। এ কারণে লেখকরা কিছুদিন ফিল্ড ওয়ার্কে যাচ্ছেন। সাবল্টার্নদের সঙ্গে কাটাচ্ছেন তারপর ওদের নিয়ে গল্প উপন্যাস লিখছেন। শুধু সাহিত্যক্ষেত্রে নয়, নাটক - গান, ছবি সর্বত্রই এমনটা দেখা যায়। এ'পেরিমেন্টের নামে এইসব প্রবণতায় ফোকভঙ্গিটাই হয়তো গ্রহণ করা যায়, তাতে প্রাণরস থাকে না। বলাবাহুল্য 'শবর চরিত' এ ধরনের বিলাসী কাজ নয়। তো সাবল্টার্নদের নিয়ে এ ধরনের যে কাজকর্ম হচ্ছে-সে সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

লেখক ঃ মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

শবর চরিতকার শ্রী নলিনী বেরার কাছে কিছু লিখিত প্রশ্ন রাখা হয়েছিল। তার উত্তর তিনি লিখিতভাবেই দিয়েছেন। তাই সাক্ষাৎকারধর্মী প্রশ্নোত্তরটিকে 'লিখিত সাক্ষাৎকার' রূপে চিহ্নিত করা হল।

-সম্পাদক।